প্রবন্ধ

শহিদ দাভোলকার ও কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন— একটি বীক্ষণ

স্বপন শীল

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কেবল বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীরা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন তাই নয়, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন, নিহত হচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করার দাবিতে কর্মরত যাঁরা তাঁদেরও অনেকে আততায়ীর হাতে শহিদ হয়েছেন। এখন গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরাও শহিদের তালিকায়। শহিদ নরেন্দ্র দাভোলকরের উদ্দেশে নিচের প্রবন্ধটি নিবেদিত হলো।

প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রভূমিতে কুসংস্কার তথা অবৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের অনুশীলনের বিরোধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নতুন কিছু নয়। আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বয়স ধরি ৩০০-৩৫০ বছর, তাহলে এর শুরু থেকেই এই বিরোধিতা ও কখনো কখনো আন্দোলন পাশাপাশি অবস্থান করেছে। ইতিহাসের যে কোন বিন্দুতেই সমাজের অধিকাংশ মানুষ গতানুগতিক বিশ্বাস ও রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল থাকে। তবে অল্প সংখ্যক হলেও কিছু মানুষ সমস্ত গতানুতিক বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অনুমোদন দেয় না, এগুলির প্রতি সন্দিহান থাকে। প্রাচীন সমাজে সংখ্যালঘু মানুষের এই সন্দেহ আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেত না বললেই চলে, কারণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের (Experimental science) বিকাশ না ঘটার দরুন কোন রীতিনীতি বা বিশ্বাসকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ— কোনটা করাই সম্ভব হতো না। বিপরীতে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ শুরু হওয়ার পর এই সুযোগ ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে এবং সন্দেহ কখনো কখনো আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাহীরা সংখ্যাগুরু মানুষের সহজ ও অকপট বিশ্বাসকে মূলধন করে সর্বদাই এই আন্দোলনকে আক্রমণ করে থাকে, এবং আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিদের নানাভাবে হেনস্থা করে। উদাহরণের অভাব নেই। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ শুরু হতেই জিওদার্নো ব্রুনোকে খ্রিস্টান পাদ্রিরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, পোপের নির্দেশে গ্যালিলিওকে আজীবন কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। ডারউইনকে বিচার করতে না পারলেও ইংল্যান্ডের আর্চবিশপ উইলবারফোর্স নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করার চক্রান্ত থেকে কখনও ক্ষান্ত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রমিথিউসকেই কায়েমি স্বার্থবাহীদের অত্যাচার ও চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে। এই পরম্পরায় অতি সাম্প্রতিক সংযোজন নরেন্দ্র দাভোলকার।

নরেন্দ্র দাভোলকার ছিলেন মহারাষ্ট্রের 'অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠাতা, কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও নেতা। জ্যোতিষী, ওঝা ও বিভিন্ন গুরুবাদীদের কালো যাদু (Black magic) এবং তথাকথিত অলৌকিক চিকিৎসা ও কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে তিনি কুসংস্কার বিরোধী একটি আইনের খসরা (বিল) মহারাষ্ট্র সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য গত তিন-চার বছর ধরে তিনি এবং তার সহকর্মীরা লাগাতার আন্দোলনে রত ছিলেন। বিলটি ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদিত হলেও অদৃশ্য কোনো কারণে মহারাষ্ট্র সরকার তা বিধানসভায় কখনও পেশ করেনি।

নরেন্দ্র দাভোলকারদের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাহী চক্রের প্রধান মুখ হিসেবে প্রকাশ্যে কাজ করত 'সনাতন সংস্থা' নামে একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। 'সনাতন সংস্থা' দীর্ঘকাল ধরেই দাভোলকার এবং তার এক সহকর্মী শ্যাম মানবকে হুমকি দিয়ে আসছিল। খুন হওয়ার আগে দাভোলকার দুজন স্বঘোষিত 'গডম্যানের' অর্থাগমের উৎস নিয়ে তদন্ত করছিলেন। এই 'গডম্যান'রাও তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ দলও নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শাস্তির হুমকি দিয়েছে। এই হুমকির লক্ষ্য ছিল দাভোলকার, শ্যাম মানব, কুমার কেট্‌কার এবং দিলীপ ওয়াগলে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। দাভোলকাররা কালো যাদুর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ করতেন 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমে। আর 'সনাতন সংস্থা' তাদের মুখপত্র 'সনাতন প্রভাত'-এর মাধ্যমে দাভোলকারদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অপপ্রচার চালাত। এই বৈরিতার মধ্যে গত ২০শে আগস্ট, ২০১৩ সকালবেলা নরেন্দ্র দাভোলকার খুন হন। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, দাভোলকারের কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শত্রু ছিল না। অতএব খুনীরা যে হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়োজিত সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। খুনীদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের উদ্দেশে তদন্ত প্রক্রিয়ার ফলাফল এখনও পর্যন্ত শূন্য।

ভবিষ্যতে দাভোলকারের খুনীরা ধরা পড়বে কিনা বা এই খুনের নেপথ্যের প্রকৃত তথ্য জানা যাবে কিনা— এই প্রশ্নের সাথে এই মুহূর্তে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকে ঘিরেও অনেক প্রশ্ন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রশ্নগুলো যে

শুধু মহারাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাসঙ্গিক তা নয়, সারা দেশেই প্রাসঙ্গিক। ভারতের সব প্রদেশেই কালো যাদু, জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং প্রত্যেক প্রদেশেই এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন কমবেশি বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গেও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য গৌরবময় এবং এখনও এ আন্দোলনে ভাটা পড়েনি।

কুসংস্কার : কেন, কোথায়?

সমাজে প্রচলিত যেসব বিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধারণার অনুশীলন অবৈজ্ঞানিক তাদেরকে আমরা কুসংস্কার বলে থাকি। আবার প্রচলিত প্রতিটি বিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধারণার কিছু না কিছু সামাজিক ভিত্তি এবং সেই সূত্রে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যও আছে। এটা থাকার জন্যই এগুলি যুগ যুগ ধরে সমাজে টিকে আছে।

কুসংস্কারের সামাজিক ভিত্তি বলতে আমরা এমন কিছু বিষয়কে বুঝি যে কারণে সমাজে কোন কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে থাকে এবং তার আপাত-প্রয়োজনীয়তা নিছক ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং চরিত্রগতভাবে সামাজিক। বিষয়টাকে আমরা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।

সামাজিক উৎপাদন মানেই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যা একই সাথে সামাজিক উৎপাদনকে ঘিরে পারস্পরিক **সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব**, ব্যক্তির সাথে সমাজের দ্বন্দ্ব এবং নতুন করে প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া, অর্থাৎ একটি দ্বন্দ্বের সমাধান হলে তা থেকে আর একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ফলত, সামাজিক উৎপাদন প্রকৌশলগুলিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, তার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের পরিবর্তনশীল অভিযোজন তথা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু এখান থেকে এবং আজও তা একইভাবে বাস্তব।

ইতিহাসের কোন বিন্দুতেই উদ্ভূত দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধানকল্পে প্রকৌশল বা বস্তুর নিয়ম উদ্ভাবনের মধ্যে সাম্য ছিল না। যে কোন মুহূর্তেই প্রকৌশল বা বস্তুর নিয়ম উদ্ভাবন উদ্ভূত দ্বন্দ্বের অনেক পিছনে পড়ে থাকে। তবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনাকালে পরিস্থিতিটা ভিন্ন ছিল। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী কালে মানুষের সচেতন প্রয়াসের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে উদ্ভূত মানুষের কোন দ্বন্দ্বের সমাধান যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ তার জন্য অপেক্ষমান থাকতে পারে। কিন্তু সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা থেকে শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত মানুষের সচেতন প্রয়াস এই সুরে বাধা ছিল না, কারণ এই সময়পর্ব জুড়ে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের (experimental science) পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটেনি। এজন্য এই সময়পর্বে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে যেসব প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন হত, পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটা করারই সুযোগ ছিল না। এইসব প্রকৌশল বা নিয়মের অধিকাংশই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি তথা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের নিরিখে অপ্রমাণিত এবং মানুষ ও সমাজের পক্ষে বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর। এইসব প্রকৌশল ও নিয়মগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলব।

এখানে খুব সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। কোন নিয়ম বা প্রকৌশল যদি মানুষ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে থাকে তাহলে সুদীর্ঘকাল এসব প্রকৌশল ও নিয়ম সমাজে কীভাবে চালু ছিল। অন্তত একটি উদাহরণ সহযোগে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। ধরা যাক সর্পদংশনের কথা। সর্পদংশনের চিকিৎসা হিসেবে বেশ কিছু নিয়ম ও প্রকৌশল সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজে একরকম বাধাহীনভাবে চালু ছিল। এই নিয়ম-প্রকৌশল—সবগুলিই ছিল কালো ম্যাজিক। এদের সাথে সাপের বিষের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। আধুনিক জীববিদ্যা, বিষবিদ্যা (Toxicology) ও চিকিৎসাবিদ্যার সূত্রে আমরা জেনে গেছি বিষাক্ত সাপে কামড়ালে এবং দংশিত মানুষের শরীরে মারণ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বিষ প্রবেশ করলে সঠিক চিকিৎসা না হলে আজও যেমন মৃত্যু অনিবার্য অতীতেও তেমনি অনিবার্য ছিল। পার্থক্য একটাই। ১৮৮৫ সালে অ্যান্টি ভেনাম সিরাম আবিষ্কৃত হওয়ার পর এখন এধরনের সর্পদংশিত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব, অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য নয়। কিন্তু ১৮৮৫ সালের আগে এধরনের সর্পদংশিত মানুষকে কোনভাবেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এতৎসত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল কালো যাদুর টিকে থাকার প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে এই প্রকৌশলগুলি সর্পদংশনকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের একধরনের সমাধান। এগুলি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল আরও দুটো কারণে। প্রথমত, সর্পদংশনের একটি অংশ অবিষাক্ত সাপের দংশন। এদের উপরেও কালো যাদুর প্রকৌশলগুলি প্রয়োগ করা হত এবং তাদের বেঁচে যাওয়ার কৃতিত্ব বর্তাতো কালো যাদুর উপর। দ্বিতীয়ত, বিষাক্ত সাপের দংশন হলেও মারণ পরিমাণের চাইতে অনেক কম পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু ঘটে না। এর কৃতিত্বও পেত কালো যাদু। আর যে সব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটত তার দায় চাপান হত 'বিধাতা নির্ধারিত আয়ুষ্কাল'-এর উপর। অতএব সর্পদংশন কেন্দ্রিক কালো যাদু ভিত্তিক 'চিকিৎসা' সুদীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে অসুবিধা হয়নি। এভাবেই সমস্ত কালো যাদু তথা কুসংস্কার সুদীর্ঘকাল টিকে ছিল, যদিও সবক্ষেত্রে কারণগুলি একই রকম ছিল না।

কুসংস্কারের বিবর্তন ও ধর্ম

শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ধর্ম বলতে বুঝব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে, যা চরিত্রগতভাবে ইংরেজি শব্দ reli-

gion-এর সমার্থক। অন্যান্য কুসংস্কারের মত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরও নেপথ্যে রয়েছে একধরনের দ্বন্দ্বের সমাধান, তবে এ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব একেবারে শুরুতেই মানব সমাজে আবির্ভূত হয়নি। বিবর্তনের পথে সমাজ অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর এসব দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হয়েছিল।

সমাজ বিবর্তনের প্রথমদিকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলি ছিল অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত সংহত করা অভিমুখীন এবং দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে কোন নতুন প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন ঘটত বা পুরানো কোন প্রকৌশল বা নিয়মের নবীকরণ হতো। শুধু প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন ঘটলেই দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না, এদের অনুশীলনকে সমাজে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়াও দ্বন্দ্ব-সমাধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, এই প্রক্রিয়া থেকেই ক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উৎপত্তি লাভ করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে। যেমন সর্পদংশনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল এবং নিয়মগুলির অনুশীলনকে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখার কাজটি করে এসেছে একশ্রেণীর মানুষ, যাদেরকে ওঝা বলা হয়। অতএব ওঝা এবং ধারাবাহিক অনুশীলনের প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রে বলা হবে সর্পদংশন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলগুলির প্রতিষ্ঠান। এভাবে অসংখ্য দ্বন্দ্ব, অসংখ্য প্রকৌশল ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান একটি পর্যায়ে সমাজকে সংহত করার পর উদ্ভূত দ্বন্দ্বের চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পূর্বে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের অভিমুখ ছিল অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে সংহত করা। এবার এই দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হতে শুরু করল অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব। নতুন চরিত্রের এই দ্বন্দ্বের সমাধান প্রক্রিয়া ছিল খুবই জটিল। পূর্বের মত প্রকৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব ছিল না। অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের সমাধান বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জানা-বোঝার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জানা-বোঝার জন্যে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ যে মাত্রায় প্রয়োজন তা শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও ছিল না। সমাজ বিবর্তনের ঠিক এই অবস্থানে সৃষ্টিতত্ত্ব (creationism) প্রাসঙ্গিক হতে শুরু করে। পৃথিবার যে যে অঞ্চলে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল তার সর্বত্রই এই প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলত সব অঞ্চলের সমাজেই কোন না কোন প্রকারে সৃষ্টিতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। অঞ্চলভেদে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকারে বিভিন্নতা ছিল, কিন্তু মৌলিক উপপাদ্যটি সর্বত্র একই এবং তা হল— "এই দেখা, না-দেখা বস্তুজগৎ এবং পৃথিবীর উপর মানুষসহ সমগ্র জীবজগৎ কোন এক অদৃশ্য, অধরা, সর্বশক্তিমান (Almightly) সত্তা দ্বারা সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত এবং সেই সত্তাটি (Entity) এই বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ।"

অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত অসংখ্য দ্বন্দ্বের একটি একীভূত সমাধান এই সৃষ্টিতত্ত্ব। এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিও খুব জটিল এবং অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাকে স্থিতিশীলতা (stability) অর্জন করতে হয়েছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের কার্যকর অভিমুখ যেহেতু সর্বব্যাপী, সেহেতু মানুষেরও যাবতীয় কাজকর্ম, প্রয়াস ও আন্তঃসম্পর্ক, সবই সেই সর্বশক্তিমান সত্তার নিয়ন্ত্রণের অধীন। অতএব সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকে উদ্ভাবিত সমস্ত নিয়ম ও প্রকৌশলের প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানের সাথে এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সম্পর্কিত করা না যায় তাহলে সর্বশক্তিমান সত্তার কর্তৃত্বের সমান্তরাল আর একটি কর্তৃত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে, যা সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী। এটাই ছিল সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের জটিলতার প্রধান কারণ। যাইহোক, সব অঞ্চলের সমাজে সমস্ত প্রকৌশল ও নিয়মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশ অঙ্গীভূত করে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান বিকাশলাভ করতে শুরু করে।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানই কোন কোন সমাজে পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ছোট ছোট সমাজ, যেখানে সামাজিক উৎপাদন প্রকৌশলের বিস্তৃতি খুব স্বল্প পরিসরে বিকাশ লাভ করেছিল, সেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেছে। এইসব সমাজের অস্তিত্ব বহু অঞ্চলে এখনও রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক উপপাদ্যটি এসব সমাজেও একই রকম।

শিল্পবিপ্লব ও বোধের জগতে নতুন তাড়না

প্রকৌশল উদ্ভাবনের প্রবাহ থেমে থাকেনি। এই প্রকৌশলগুলির মধ্যে সামাজিক উৎপাদন কেন্দ্রিক প্রকৌশলগুলির একটি প্রধান দিক ছিল হাতিয়ার বা টুল। উৎপাদনের নিরিখে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে হাতিয়ার মানুষের শ্রম/প্রয়াসকে বিবর্ধনে সক্ষম। কিন্তু হাতিয়ারের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ ন্যূনতম এবং প্রায় নির্দিষ্ট। টুলের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হলে নিয়োজিত কর্মীসংখ্যাও বাড়াতে হবে। ইংল্যান্ড তথা ইউরোপীয় সমাজে শিল্প বিপ্লবের আগে এই সমস্যাটাই উপস্থিত হয়েছিল। রপ্তানির লক্ষ্য মাথায় রেখে বিশেষ কয়েকটি পণ্য (যার মধ্যে সুতি বস্ত্র অন্যতম) উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে গিয়ে এত বেশি সংখ্যক মানুষ নিয়োগ করতে হয়েছিল যে অন্যান্য পণ্যের সামাজিক উৎপাদন ও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এটাই ঠিল তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছিল হাতিয়ার বা টুল থেকে মেশিন বা যন্ত্রে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য টুলের উল্টো। যন্ত্র মানুষের শ্রম/প্রয়াসের বহুগুণ বিবর্ধনে সক্ষম।

এটাই শিল্প বিপ্লব। এর তাৎক্ষণিক ফল হলো দুটি। প্রথমত,

বাজারের ব্যাপক সম্প্রসারণ, এবং দ্বিতীয়ত, অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা। আধুনিক পুঁজিবাদের জন্মও এখান থেকে। শুরুতে পুঁজি-প্রভুরা বুঝতে না পারলেও, অচিরেই তারা বুঝতে শিখল যে বাজার-প্রতিযোগিতাকে চলমান রাখার অন্যতম উপায় যন্ত্র-ভিত্তিক প্রযুক্তির (Machine based technology) ক্রম-উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী। যার ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচীত হল। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে যতটুকু ভাবনা-চিন্তা হত তাতে বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রভাব ছিল কম। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর বাজার-প্রতিযোগিতাকে চলমান রাখার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণায় প্রাধান্যকারী ভূমিকায় চলে এল বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং এর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental science)। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আজ বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। বস্তুজগতের অন্দরমহলের অনেক দ্বন্দ্ব ও রহস্য আজ আমাদের জানা হয়ে গেছে। সাথে সাথে অবশ্য অজানার পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অজানার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ, এখন আর নিছক কল্পনার মাধ্যমে বা বস্তুনিরপেক্ষভাবে কোন দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও
পুরানো রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশল

শিল্পবিপ্লবের আগে বস্তু-নিরপেক্ষ রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশলে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও তা আন্দোলনে পৌঁছতে পারত না, কারণ এগুলিকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার উপযোগী পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে এই পরিকাঠামো তৈরি হওয়াতে বস্তু-নিরপেক্ষ রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশলসমূহ ক্রমশ অপ্রমাণিত হতে শুরু করল এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত আলগা হতে শুরু করল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি শুরুতে খুব কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর মোকাবিলা করতে শুরু করেছিল। আগেই বলেছি, ব্রুনোকে খুব তুচ্ছ কারণে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা হত্যা করেছিল। ব্রুনো, কোপার্নিকাস আবিষ্কৃত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্ব প্রচারে নেমেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস ছিল ভূ-কেন্দ্রিক সৌরজগত। এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল এই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভূ-কেন্দ্রিক সৌরজগৎ তৈরি করেছেন। আর সেই পৃথিবীতে এনেছেন মানুষকে। টলেমী এটা আবিষ্কার করেছিলেন। সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ বলার অর্থ সর্বশক্তিমানকে চ্যালেঞ্জ জানানো। ব্রুনোর এই চ্যালেঞ্জ পোপ ও পাদ্রিরা মেনে নিতে পারে নি। ডারউইন-এর চেয়ে বেশি অপরাধ করেছিলেন তিনি ঃ সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্বের ঝুঁটি ধরে টান মেরেছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা খুব ক্ষিপ্ত হলেও ব্রুনোকে যেমন জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল বা গ্যালিলিওকে আজীবন কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তেমন কোন শাস্তি তারা ডারউইনকে দিতে পারেনি। এর কারণ অবশ্যই শাসকশ্রেণীর রদবদল।

ব্রুনো থেকে ডারউইন প্রায় আড়াইশো বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে সামাজিক-উৎপাদন ব্যবস্থার উপর পুরোনো সামন্ত-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিস্থাপন করে পুঁজি তার নিয়ন্ত্রণকে অনেক সংহত করে নিয়েছে। সামন্ত শাসকশ্রেণীর উপর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কর্তৃত্ব ছিল এতই প্রবল যে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর উপর এরকম কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। পুঁজি-প্রভুরাও এ জাতীয় কর্তৃত্বের প্রতি আগ্রহী ছিল না তাদের বাজারের স্বার্থে। ডারউইনকে একারণেই গুরুতর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি।

যাই হোক, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা বস্তুজগৎ ও জীবজগতের নিয়মাবলীকে আরও ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করে দেয়। বস্তু ও মানুষসহ জীবজগতের অস্তিত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর এখন বিজ্ঞানীদের জানা। কিন্তু এই জানাটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের বোঝায় (understanding) পরিণত হয়নি। এখানেই কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য সংগঠন কোনদিনই এই আন্দোলনের সহায়ক ছিল না। শুধু কালো যাদুই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিতত্ত্বও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও পরিচালকদের আচরণ ও নিয়মনীতিতে বিভিন্ন কুসংস্কার ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব অটুট। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও এর হেরফের নেই। ফলত, বিভিন্ন কুসংস্কার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সক্রিয়তা বজায় রাখতে মরিয়া। পুঁজি তার আগের অবস্থানে নেই। একসময় বাজার সম্প্রসারণের স্বার্থে এবিষয়ে পুঁজি যেটুকু উদার ছিল বর্তমানে তার বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই। বরং পুঁজি এখন নিজেই কুসংস্কার ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় রাখতে উদ্যোগী। নানাবিধ সংকটের মোকাবিলায় পুঁজির এখন প্রয়োজন মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে রাখা। এই কাজে ধর্ম, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার মত ধারালো অস্ত্র আর নেই। অতএব কুসংস্কার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পুঁজিও আজ কায়েমি স্বার্থের অন্যতম অংশীদার। নরেন্দ্র দাভোলকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এটাই আমাদের আবারও বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আগামী দিনে যদি কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হয় তাহলে এই আন্দোলনের বিরোধী পুঁজিবাদী এবং সামন্তবাদীদের একই লেন্স দিয়ে দেখতে হবে।